EAST WEST UNIVERSITY
Excellence in education

নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা

ও

সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০২২

২৬ জুলাই ২০২২, মঙ্গলবার, বিকাল ৩.৩০ মিনিট

শিক্ষক মিলনায়তন

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-১২১২

ট্রাস্ট দলিল

নেহরীন খান স্মৃতি তহবিল, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ৩০ জানুয়ারী ২০১৭

নেহরীন খান স্মৃতি তহবিলের উদ্দেশ্য ঃ

প্রতি বছর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচনী কমিটির মাধ্যমে একজন সাহিত্যিককে তার অবদানের স্বীকৃতির জন্য নির্বাচন করে সম্মাননা প্রদান করা হবে এবং তাঁকে নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। তার বক্তৃতা ছাপানো হবে এবং সভাস্থলে বিতরণ করা হবে। নির্বাচিত সাহিত্যিককে কমপক্ষে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ও একটি ক্রেস্ট উপহার হিসেবে প্রদান করা হবে।

ট্রাস্টি বোর্ড, নেহরীন খান স্মৃতি তহবিল ঃ

০১.	**জনাব এ. জেড. এম. শফিকুল আলম** কোষাধ্যক্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সভাপতি
●২.	**ড. আকবর আলি খান** সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।	দাতা সদস্য
০৩.	**জনাব জহুর আহমেদ** সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য
০৪.	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান** সচিব, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য সচিব

নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতার সম্মানিত বক্তা নির্বাচনী কমিটি ঃ

০১.	**অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম** পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পীস এন্ড লিবার্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সভাপতি
●২.	**ড. আকবর আলি খান** সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।	সদস্য
০৩.	**ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৪.	**জনাব মাহফুজ আনাম** প্রকাশক ও সম্পাদক, দি ডেইলী স্টার।	সদস্য
০৫.	**জনাব মোঃ সাজ্জাদ শরীফ** ম্যানেজিং এডিটর, দৈনিক প্রথম আলো।	সদস্য
●৬.	**অধ্যাপক ড. ফওজিয়া মান্নান** ডীন, ফ্যাকাল্টি অব লিবারেল আর্টস এন্ড সোশাল সায়েন্স ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য
●৭.	**জনাব এ. জেড. এম. শফিকুল আলম** কোষাধ্যক্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য

এক নজরে নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান ঃ

ক্রমিক নং	সম্মানিত বক্তা	বিষয়	তারিখ
০১.	**ড. এ. এফ. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী** এমিরেটাস অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	মানা এবং না-মানার প্রশ্ন	১২ জুলাই ২০১৭
০২.	**ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম** ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সাহিত্য ও সমাজে নিম্নবর্গীয়তা ঃ বৃত্তের ভেতরে জীবন	৪ ডিসেম্বর ২০১৮
০৩.	**ড. ফকরুল আলম** ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	THE IDEA OF A UNIVERSITY IN OUR TIME	২৫ জুলাই ২০১৯
০৪.	**সেলিনা হোসেন** একুশে ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কথা সাহিত্যিক ও সভাপতি, বাংলা একাডেমি।	সাহিত্যের ভুবনে লেখকের পথচলা	২৬ জুলাই ২০২২

Nahreen Khan Memorial Bursary, East West University তহবিল ঃ

নেহরীন খান স্মৃতি তহবিল, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে নেহরীন খান এর প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগের এক বা একাধিক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের জন্য ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে "Nahreen Khan Memorial Bursary, EWU" নামক তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে স্বেচ্ছায় অনুদান প্রদানকারীদের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	অনুদান প্রদানকারীর নাম	পরিমাণ (টাকা)
০১	**অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম** সাবেক উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ও নেহরীন খান- এর শিক্ষক।	১,০০,০০০/-
০২	**ড. আকবর আলি খান** সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও নেহরীন খান- এর বাবা।	১,০০,০০০/-
০৩	**সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী** সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি , ঢাকা ও চেয়ারম্যান, এ্যাপেক্স গ্রুপ।	১,০০,০০০/-

নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০২২

বিষয় ঃ সাহিত্যের ভুবনে লেখকের পথচলা

অনুষ্ঠানসূচী

বিকাল ৩:৩০ মিনিট	ঃ	অতিথিদের আসন গ্রহণ
বিকাল ৩:৩৫ মিনিট	ঃ	স্বাগত বক্তব্য **অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম** সভাপতি, সম্মানিত বক্তা নির্বাচনী কমিটি, নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পীস এন্ড লিবার্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
বিকাল ৩:৪০ মিনিট	ঃ	বিশেষ অতিথির বক্তব্য **অধ্যাপক ড. এম. এম. শহিদুল হাসান** উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
বিকাল ৩:৪৫ মিনিট	ঃ	নেহরীন খান - এর পরিচিতি **জনাব আরিফুল ইসলাম** সিনিয়র প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
বিকাল ৩:৫৫ মিনিট	ঃ	সম্মানিত বক্তার বক্তৃতা **সেলিনা হোসেন** একুশে ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কথা সাহিত্যিক ও সভাপতি, বাংলা একাডেমি।
বিকাল ৪:৩৫ মিনিট	ঃ	প্রধান অতিথির বক্তব্য **সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী** সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
বিকাল ৪:৪০ মিনিট	ঃ	সভাপতির বক্তব্য **অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন** মুখ্য উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
বিকাল ৪:৪৫ মিনিট	ঃ	সম্মাননা প্রদান
বিকাল ৪:৫০ মিনিট	ঃ	ধন্যবাদ জ্ঞাপন **জনাব এ. জেড. এম. শফিকুল আলম** কোষাধ্যক্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
বিকাল৪:৫৫মিনিট	ঃ	আপ্যায়ন

নেহরীন খান পরিচিতি

নেহরীন খান
(১৯৭৭-২০১৬)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. আকবর আলি খান ও হামীম খানের একমাত্র সন্তান নেহরীন খান ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই তারিখে কানাডার কিংস্টন শহরের জেনারেল হাসপাতালে জন্ম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ঐ সময়ে তার পিতা কিংস্টনের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা করেছিলেন।

শিক্ষা জীবন ঃ

নেহরীন খান ১৯৭৯ সালে মা-বাবার সাথে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮০ সালে তিনি কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু স্কুল তার মোটেও ভালো লাগত না। ক্লাসরুমে যাওয়ার পরেই তিনি তার মায়ের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন। ১৯৮১ সালে তাকে ধানমন্ডির সানবীমস স্কুলে ভর্তি করা হয়। তার মা সেসময় সানবীমস স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। মা স্কুলে থাকার ফলে সানবীমসে সে আর কান্নাকাটি করত না। ১৯৮৭ সালে তার বাবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দুতাবাসে ইকোনমিক মিনিস্টার পদে বদলি হন। নেহরীন মন্টগোমারি কাউন্টিতে বেভারলি ফার্মস স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর পোটোম্যাকের হার্বার্ট হুভার নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আরও দুই বছর লেখাপড়া করেন। ১৯৯১ সালে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকায় ফিরে 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এসব পরীক্ষার ফল ভালো হয়নি। কিন্তু তার মায়ের ধারণা ছিল যে তার মেয়ে তার মতোই মেধাবী। সুতরাং সে একজন বিজ্ঞানী হবে এবং খুব সহজেই বিজ্ঞান বিষয়ে সে 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পাস করবে। কিন্তু তার মা একটি বড় ভুল করেছিলেন। নেহরীনের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ ছিল না। সে গল্প শুনতে পছন্দ করত। ইতিহাস পড়ায় তার আগ্রহ ছিল। সাহিত্যের বদলে বিজ্ঞান চাপিয়ে দেওয়াটাকে সে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তবু সে তার মায়ের দাবী পূরণ করার চেষ্টা করত। ছোটবেলায় তার হাতের লেখা ছিল খারাপ। তার হাতের লেখাকে ভালো করার জন্য সে যখন লিখত তখন তার মা তার পাশে বসে থাকত এবং লেখা খারাপ হলে তার আঙুলে আঘাত করতেন। সে কান্নকাটি করত। প্রায় বছরখানেক কান্নাকাটি করার পর সে তার হাতের লেখা পরিবর্তন করতে সক্ষত হয়। মা ধরে নেন যে নেহরীন হাতের লেখা পরিবর্তনের মতো বিজ্ঞানশিক্ষাতেও সাফল্য অর্জন করতে পারবে। কিন্তু সেটি কোনমতেই সম্ভব হয়নি। তার পিতা তাকে জোর করে বিজ্ঞান পড়ানোর বিরোধী ছিলেন। এমনকি তিনি তাকে ইংরেজী মিডিয়ামে পড়াতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সে বাংলা মিডিয়ামে ভিকারুননিসা নূন স্কুলে দেশের অন্য ছেলেমেয়েদের মতো লেখাপাড় করুক। কিন্তু তার মা এতে মোটেও রাজী ছিলেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলা মিডিয়ামের মান নিচু। হয়তো তার মায়ের বক্তব্য সঠিক কিন্তু এতে নেহরীনের একটি বড় লোকসান হয়ে যায়। বাংলা মিডিয়ামে পড়লে তার অনেক বন্ধু হতো কিন্তু ইংরেজী মিডিয়ামে পড়তে গিয়ে সে তার প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত যখন প্রমাণিত হলো যে নেহরীনের পক্ষে বিজ্ঞান পড়া সম্ভব নয়, তখন তাকে নবপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট

ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগে ভর্তি করা হয়। ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের শেষ পর্যায়ে নেহরীন খানের বাবা বিশ্বব্যাংকে বিকল্প নির্বাহী পরিচালক পদে মনোনীত হন। সে বাবার সঙ্গে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ওয়াশিংটনে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে (The American University at Washington D.C) ভর্তি হয় এবং ২০০৫ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে বিএ ডিগ্রী অর্জন করে। এরপর সে দেশে ফিরে আসে এবং পুনরায় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করে।

কর্মজীবন ঃ

নেহরীন খান ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এক সেমিস্টার পড়ানোর পর তিনি ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা) তে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং কিছুদিন পর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১৬ সনে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভিক্টোরিয়ান সাহিত্য, রোমান্টিক সাহিত্য ও শেক্সপিরিয়ান সাহিত্য পড়াতেন।

জীবনের ছোট গন্ডি ঃ

ড. আকবর আলি খান ও হামীম খানের একমাত্র সন্তান তার আত্মজীবনের খসড়াতে লিখেছেন, 'My parents also doted on me but now as I remember my childhood I think I was being protected as well as spoilt. I had no friends at that age. My friends were my grandparents, my father and my mother.' বয়স বাড়লে সে তার নিজের পরিবারেই নিজের বয়সী বন্ধুদের খুঁজে পায়। তার বন্ধু ছিল তার মা হামীম খানের খালাতো বোন লিনেটের মেয়ে ফারাহ। হামীম খানের মামা মাহমুদ হাসান (যিনি অগ্রণী ব্যাংকের এজিএম ছিলেন)। তার দুই মেয়ে টুইংকেল ও টিনা এবং হামীম খানের মেজ মামা শামসুল আলম (যিনি ছিলেন চট্টগ্রামের চা ব্যবসায়ী) এর মেয়ে নীলা ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ ছাড়া প্রতি বছর তার বাবার ছোট ভাই জসীম এক মাসের জন্য ছুটিতে তার দুই মেয়ে জারা ও জেবাকে নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে আসত। তাছাড়া ঢাকায় ছিল তার বাবার ছোট ভাই কবীরের বড় মেয়ে তিথি। তারা একসঙ্গে খেলত। তবে পরিবারের বাইরে নেহরীনের কোন বন্ধু বান্ধব ছিল না।

সারা জীবনই নেহরীন তার মা ও বাবাকে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তার বাবা প্রতিদিন তাকে সকালে স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন এবং রাতে ক্লাস থাকলে মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। একবার ওয়াশিংটনে গুপ্ত ঘাতকের প্রকোপ দেখা দেয়। ওই সময়ে নেহরীনের পিতা সব সময় তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন এবং নিয়ে আসতেন। একবার তারা যখন বাসায় ফিরছিলেন, তখন পুলিশ তাদের সামনে দিয়ে ঘাতকের গাড়ী তাড়িয়ে নিয়ে যায়। নেহরীন তার বাবার সাহচার্য খুবই পছন্দ করত। যেদিন তিনি মারা যান, সেদিন সকালে তিনি তার পিতার কপালে হাত দিয়ে আশির্বাদ করছিলেন। তার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি হয়েছে মা? তিনি জবাবে বলেছিলেন যে তার পিতা সজাগ আছে কিনা সেটা দেখছেন। তার মৃত্যুর পর তার পিতার মনে হয় সে তার বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে।

বিশ্বাস ঃ

নেহরীনের বিশ্বাস ছিল, তার মা তাকে যে কোন বিপদ বা অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন। ছোটবেলায় তাকে একটি গল্প শোনানো হতো, গল্পটি ছিল এ রকম- একটি হাতির বাচ্চাকে দুষ্ট লোকেরা চুরি করে। নেহরীন এ গল্প বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্ন করে, 'হাতির মা কী করল?' তার বিশ্বাস ছিল যে হাতির বাচ্চার মা-বাবা নিশ্চয়ই তাকে রক্ষা করবে। এ ধারণাটি অবশ্যই ভুল ছিল। নেহরীন তার জীবন দিয়ে শিখে গেল বাবা-মা সব সময় তার সন্তানকে রক্ষা করতে পারে না।

নেহরীনের অসমাপ্ত গবেষণাঃ

নেহরীন খান তার স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনটি বিষয়ে গবেষণা করেছেন। প্রথম বিষয়টি হলো ইংরেজীতে যাকে বলে Home বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে ঘর। নেহরীন সারা জীবনই ঘর খুঁজে বেড়িয়েছে। জন্ম তার কানাডায়। প্রায় দেড় বছর বয়সে কানাডা থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসে। আবার দশ বছর বয়সে চার বছরের জন্য পিতার তৎকালীন কর্মস্থল আমেরিকায় চলে যায়। চার বছর আমেরিকায় থাকার পর দেশে ফিরে এসে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী শেষ করার আগে আবার ২০০২ সালে তিন বছরের জন্য পিতার কর্মস্থল আমেরিকাতে যায় এবং বছর তিনেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে। বাংলাদেশ, কানাডা এবং আমেরিকায় বারবার যাওয়া আসার ফলে তার অভিবাসী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ জন্মে। ভারতী মুখার্জী, জুম্পা লহিড়ী, মণিকা আলী প্রমুখ ছিল তার প্রিয় লেখক। অভিবাসীদের সত্তাসংকট বা Identity crisis ছিল তার আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির গবেষণার বিষয়। নেহরীন খান লক্ষ্য করেন যে অভিবাসীদের মধ্যে ঘরে ফেরার একটি প্রচন্ড ঝোঁক রয়েছে কিন্তু অর্থাভাবে তারা কম বয়সে দেশে ফিরতে পারে না। যখন তাদের অর্থাভাব দুর হয়, তখন তারা দেশে ফিরতে চায়; কিন্তু দেশে ফিরে দেখতে পায়, যে দেশ ছেড়ে তারা গিয়েছিল সে দেশ আর নেই। কালের বিবর্তনে সে দেশ হারিয়ে গেছে এবং এখন যে দেশ, সে দেশকে তারা চিনে না। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

"The immigrants imagine that their old homes is like Keats's Grecian Urn where nothing changes. The returning immigrants discover to their utter surprise that their dear and near ones have either passed away or changed. The new inhabitants in their homeland are unknown. The homeland that is vivid in their mind does not exist any longer."

তার গবেষণার দ্বিতীয় বিষয় ছিল মোনালিসা। ১৯৯৮ সালে নেহরীন তার পিতার সঙ্গে প্যারিস ল্যুভ জাদুঘরে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা ছবি দেখতে যায়। ছবিটি দেখার পর তিনি লিখেনঃ

"One thing that struck me as I looked on was how alive and real she looked. This picture portrays an actual woman of flesh and blood. She had lustrous almond shaped eyes with a watery sheen on them. She had quite visible eyebrows and eyelashes. It was so clear a picture that even the hair ends from her forehead could be seen. She looks so much alive that she seems to look back at the onlooker. Even the shadow of her nose was visible and the fleshy inside of her nostrils were visible. Her lips curved into a pleasing smile though her face wore a melancholy look. Leonardo da Vinci copied every little cletail and every little line bring the portrait to life."

মোনালিসাকে নিয়ে গবেষণা করতে করতে তিনি তার ঘরের মধ্যেই এক দোসর খুঁজে পান। এ দোসরের নাম লিপি। লিপি তার ফুফাতো বোন। সে কানে শুনত না এবং কথা বলতে পারত না। অথচ সে সুন্দরী ও চটপটে ছিল এবং জীবনকে ভালবাসত। তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্বামী, ছেলে মেয়ে কারোর সঙ্গেই তার পুরোপুরি সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মোনালিসার সঙ্গে তুলনা করে সে লিখেছে ঃ

"Mona Lisa has a smile like her but Mona Lisa does not say anything and she is just a painting. But my cousin is a real human being. Mona Lisa will always remain smiling and she can never change her expression but my cousin can because she is capable of all emotions and can express them all. I dreamt of speaking to Mona Lisa because it is easy to do so but it is not all easy to dream of speaking to Lipi. I wanted to hear Mona Lisa's voice and I did in my dreams but I cannot hear my cousin speak. I would do anything to make her a full sentence."

তার অসমাপ্ত নোটগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সে মোনালিসা, লিপি ও হেলেন কেলারকে নিয়ে একটি গল্প লেখার চেষ্টা করছিল। তিন নায়িকা সম্বন্ধেই আলাদা আলাদাভাবে অনেক কিছুই লিখেছে। এগুলো একত্র করলে হয়তো একটি সুন্দর গল্প রচিত হতে পারত।

নেহরীনের তৃতীয় গবেষণার বিষয় ছিল ভারতে মহিলাদের অবস্থান। তিনি শুধু ভারতীয় মহিলাদের আর্থিক দুরবস্থা নিয়েই চিন্তিত ছিলেন না, তাদের সামাজিক দুরবস্থা নিয়েও তিনি অনেক বেশী চিন্তিত ছিলেন। এ জন্য প্রয়োজন মহিলাদের চেতনার সম্প্রসারণ। এ সম্পর্কে লেখার জন্য তিনি আরও পড়াশোনা করছিলেন। নেহরীন খান কোন গবেষণাই শেষ করে যেতে পারেননি। তবে তার লেখার জন্য যেসব নোট করেছিলেন, তা পড়লে বোঝা যায় তার অনেক সুন্দর লেখার সম্ভাবনা ছিল। এ লেখাগুলো পড়লে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে পড়ে ঃ

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

সম্মানিত বক্তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংকটের সামগ্রিকতা। বাঙালির অহংকার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর গল্প উপন্যাস ইংরেজী, রুশ, ফরাসি, জাপানি, স্প্যানিস, মালয়লাম, আসামী, মেলে ও কানাড়ী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন রাজশাহী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস লক্ষীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রামে। বাবা এ. কে. মোশাররফ হোসেনের আদিবাড়ী নোয়াখালি হলেও চাকরীসূত্রে বগুড়া ও রাজশাহীতে থেকেছেন দীর্ঘকাল; কাজেই তাকে একেবারে ছোটবেলায় নোয়াখালিতে বেশীদিন থাকতে হয়নি। সেলিনা হোসেনের মায়ের নাম মরিয়ম-উন-নেসাবকুল। তিনি তাঁর পিতা-মাতার নয় সন্তানের মধ্যে চতুর্থ।

সেলিনা হোসেন ১৯৫৪ সালে বগুড়ার লতিফপুর প্রাইমারী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫৯ সালে রাজশাহীর পি.এন. গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৬২ সালে মাধ্যমিক এবং ১৯৬৪ সালে রাজশাহী মহিলা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৬৭ সালে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৬৮ সালে এম.এ. ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর'।

সেলিনা হোসেন ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এর পূর্বে তিনি বিভিন্ন পত্রিকার উপ সম্পাদকীয়তে নিয়মিত লিখতেন। কর্মরত অবস্থায় তিনি বাংলা একাডেমির 'অভিধান প্রকল্প', 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ প্রকল্প', 'বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলী প্রকাশ', 'লেখক অভিধান', 'চরিতাভিধান' এবং 'একশত এক সিরিজের' গ্রন্থগুলো প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ২০ বছরেরও বেশী সময় ধরে তিনি 'ধান শালিকের দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা পরিচালক হন। ২০০৪ সালের ১৪ জুন চাকরী থেকে অবসর নেন। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের মোট উপন্যাসের সংখ্যা- ৪৬টি, গল্পগ্রন্থ- ১৭টি, প্রবন্ধ- ১৫টি, শিশু-কিশোর সাহিত্য- ৪১টি, সম্পাদিত গ্রন্থ- ১১টি এবং ইংরেজী অনুবাদ- ১২টি।

সেলিনা হোসেন রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ১৯৬৪ সালে চ্যাম্পিয়নশীপ স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হন। এরপর তার ঝুলিতে অসংখ্য পুরস্কার জমা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুরস্কার সমূহ: ড. এনামুল হক স্বর্ণপদক (১৯৬৯), উপন্যাসে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮০), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), ফিলিপস্ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৪), শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৬, ১৯৯৭), দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যে 'রামকৃষ্ণ জয়দয়াল হারমনি অ্যাওয়ার্ডস' দিল্লি (২০০৬), ভাষা ও সাহিত্যে একুশে পদক (২০০৯), দিল্লির ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে 'রবীন্দ্র স্মৃতিপুরস্কার' (২০১০), রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা থেকে 'ডি-লিট' উপাধি (২০১০), সার্ক সাহিত্য পুরস্কার (২০১৫), গীতাঞ্জলি সম্মাননা পদক, কলকাতা (২০১৫), ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটার্স এ্যান্ড লিটারেচার, দিল্লি প্রদত্ত 'সাহিত্য পুরস্কার' (২০১৫), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট ডিগ্রী (২০১৮), সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কার (২০১৮) এবং 'তবু একলব্য' স্মারক সম্মাননা, কলকাতা (২০২১)।

কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বিভিন্ন প্রকার সম্মানে ভূষিত হন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্মাননা সমূহঃ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মান সূচক 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি লাভ, ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটার্স এন্ড লিটারেচার এর গভর্নিং কাউন্সিলে সার্ক দেশ সমূহের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত সদস্য (২০১৫), বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের অবৈতনিক সদস্য (২০১০-১২), ইউনেস্কো নির্বাহী পরিচালনা বোর্ডের বাংলাদেশ প্রতিনিধি (২০১০-১৩) এবং বঙ্গবন্ধু চেয়ার, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা (২০২০-২১)।

কথা সাহিত্যিক, লেখক ও ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের বিভিন্ন গ্রন্থ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাস রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজ, 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' ও 'হাঙরনদী গ্রেনেড' উপন্যাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ পত্রে পাঠ্য, 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, 'কালকেতু ও ফুল্লরা' উপন্যাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন ও জেন্ডার স্টাডিস বিভাগে এবং 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' উপন্যাসটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য।

তাঁর গল্প-উপন্যাসনিয়ে মোট ১৩টি পিএইচডি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তি নিকেতন- এ ২০১৬ সালে। ২০১৭ সালে আয়োজিত কনভোকেশনে গবেষক সুফিয়া সুলতানা সার্টিফিকেট লাভ করেন। এরপরে আরও ১২ জন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করে।

সাহিত্যের ভুবনে লেখকের পথচলা

সেলিনা হোসেন

২০২২ সালে নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হওয়ায় আমি গৌরব বোধ করি। ২০১৭ সাল থেকে নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্য জগতের বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ। ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমকে। তিনি সভাপতি, বক্তা নির্বাচনী কমিটি, নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা অনুষ্ঠান। আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই বছর আমাকে নির্বাচন করার জন্য। পাশাপাশি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই নেহরীনের বাবা জনাব আকবর আলী খানকে। তিনি আমাকে তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ 'পুরানো সেই দিনের কথা' পাঠান। আমি প্রবল আগ্রহ নিয়ে গ্রন্থটি পড়ে ফেলি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘ সময়ের। বাংলা একাডেমির চাকরি সূত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। নানা দিনে আড্ডায় সময় কেটেছে। তাঁর শিল্প-সাহিত্যের ভালোলাগার সূত্র নানাভাবে বলতেন। জমে উঠত আড্ডা। আমার চারপাশের আরও অনেকে যুক্ত হতেন। আমি বিষয় নির্বাচন করার আগে নেহরীনের সম্পর্কে জানতে পারি তাঁর বাবা আকবর আলি খানের 'পুরানো সেই দিনের কথা' গ্রন্থ থেকে। এই বইয়ের ৮৭ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে : 'কর্মজীবন : নেহরীন খান ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেয়। এক সেমিষ্টার পড়ানোর পর সে ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা) এ প্রভাষক হিসেবে যোগ দেয় এবং কিছুদিন পর সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পায়। ২০১৬ সালে তার অকালমৃত্যু পর্যন্ত সে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে ভিক্টোরিয়ান সাহিত্য, রোমান্টিক সাহিত্য ও শেক্সপিরিয়ান সাহিত্য পড়াত।'

সাহিত্যের প্রতি নেহরীন খানের অনুরাগ দেখে আমি নিজের প্রবন্ধ উপস্থাপনের বিষয় সাহিত্য নিয়ে নির্ধারণ করি। শিরোনাম রাখি 'সাহিত্যের ভুবনে লেখকের পথচলা।'

একজন লেখক তাঁর সাহিত্য-ভাবনাকে রাষ্ট্র, সমাজ, মানুষ এবং দেশজ প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে রাখেন। সে শেকড় চলে যায় গভীর থেকে গভীরে, তিনি অনবরত সেখান থেকে রস শোষণ করেন। এই শোষার মধ্যে লেখক থেকে লেখকের পার্থক্য আছে। যিনি যতো গভীর করে আত্মস্থ করেন তিনি ততো বড়ো শিল্পী। সাহিত্যের অনেকগুলো বিষয় আছে যা চিরকালীন, যেমন প্রেম, মানবতা ইত্যাদি। কিন্তু লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রচনার কৌশলের গুণে তার ব্যাঞ্জনা আলাদা হয়ে যায়। তাই একজন লেখককের সাহিত্য-ভাবনায় আত্মস্থ এবং প্রকাশ এ শব্দ দুটো অনবরত ক্রিয়াশীল। প্রথম শর্ত, বক্তব্যের গভীরতা। নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈদগ্ধ্যের জারক রসে আত্মস্থ করা। দ্বিতীয় শর্ত, নির্মাণকৌশল। নির্মাণের মাধ্যমে শিল্পের কারুকাজ প্রস্ফুট করে তোলা। এই দুয়ের সাযুজ্য এবং সম্মেলনের প্রগাঢ় বিন্যাস একজন লেখকের সাহিত্য-ভাবনার প্রাথমিক পদক্ষেপ। সাহিত্যের যে শাখাই তিনি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করুন না কেন এ দুয়ের মুখোমুখি তাকে হতেই হবে।

সাহিত্য তেমন একটি নিসর্গ, যার বিন্যাসমাত্রই শারীরিক এবং মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডের যুথবদ্ধ প্রকাশ। এ প্রকাশ দেশীয় জীবনাচারের বাঙ্ময় উপলব্ধিতে মানুষের সুপ্ত জিজ্ঞাসাকে তীক্ষ্ণ করে। এ রঙিন পটভূমিতে থাকে দেশের মানুষ, সমাজ, ঐতিহ্য, প্রকৃতি। এবং সেই প্রসঙ্গে সভ্যতার ধারাবাহিকতার সঙ্গে লেখকের দার্শনিক মানসপ্রক্রিয়া। এর কোনোটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জীবনের সামগ্রিক রূপকল্প উপন্যাসের শিল্প বলে বিচিত্র ও মানবিক জনপদ তার চেতনার প্রখর সৈনিক। শুধু মগজের বুদ্ধিবৃত্তির বিশ্লেষণ একজন শিল্পীকে এক সরলরৈখিক বৃত্তে পৌঁছায়। তাকে বহুধা জীবনের দিকপাল করে না। তাই একজন মহৎ শিল্পীর আত্মস্থ জীবন পরিক্রমায় অমৃত এবং হেমলকের সহ-অবস্থান। আনন্দ ও যন্ত্রণার বৈদগ্ধে স্থির দাঁড়িয়ে তিনি কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারেন না। দুটোতেই সমান পক্ষপাত তাঁকে অমরতার বরপুত্র করে। ঔপন্যাসিক জীবনের অবয়ব নৈর্ব্যক্তি দৃষ্টিতে দেখেন বলে আমরা ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় তার পায়ে নতজানু হই।

যে মানবিক মূল্যবোধের কথা লিখিত দলিলে উচ্চারণের কারণে লেখকের দায়িত্ব বিবেচিত হয় বিশেষ যুগে, বিশেষ সমাজব্যবস্থায় তার সংজ্ঞা বারবার পাল্টায়। তাই লেখকের দায়িত্ব কথাটি আপেক্ষিক এবং আজ পর্যন্ত কেউ লেখকের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিতে পারেনি। তিনি তাঁর প্রকাশিত রচনায় নিজস্ব বক্তব্য রেখে ক্ষান্ত হবেন না কি সক্রিয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন সেটা তাঁর বিবেচনা, তাঁর জন্য কোনো বাধ্যতামূলক দায়িত্ব নেই। কোনো সৃষ্টিশীল লেখকের জন্যে এ ধরনের বেড়ি তাঁকে খণ্ডিত করে মাত্র, তাঁর পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক নয়।

যে লেখক বক্তব্যকে আড়াল করেন না বা সোজাসুজি বিষয়ে প্রবেশ করে সমস্যা তুলে ধরে বিশ্লেষণ করেন তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন নেই। অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক কিংবা বিজ্ঞান-মনস্ক লেখক সরাসরি নিজের বিষয়ের কথা বলেন। তবুও লেখকের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বারবার। কেননা যাঁদের নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তাঁরা সৃজনশীল। তাঁদের জগৎ ভিন্ন, প্রকাশ ভিন্ন, আঙ্গিক ভিন্ন। তিনি মেধা এবং মননের সমন্বয়ে গড়েন শিল্পিত ভুবন। তাঁর সৃষ্টিশীল অনুভব মানুষের গভীর এবং সূক্ষ্মতম অন্তরকোণ স্পর্শ করে। তাঁকে হাসিয়ে, কাঁদিয়ে অভিভূত করে ভিন্ন মানুষ করে ফেলে। এজন্যই সৃষ্টিশীল লেখকের দায়ভাগ অনেক। তাঁদেরকে সমাজ-সচেতন মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হয় নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে। ভারতীয় ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে 'কলম-পেষা মজুর' বলেছিলেন। কিন্তু এতেও শেষ রক্ষা হয় না। 'মজুর' শব্দ দিয়ে লেখকের প্রকাশ ঠিকমতো আসে না। মজুর বলতে আমরা যে ব্যক্তিটিকে বুঝি তার সঙ্গে একজন লেখকের ব্যবধান অনেক। সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং মানবিক দিকটি লেখকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কলম-পেষা মজুর হয়েও তিনি সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন নাও করতে পারেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খোয়া-ভাঙা যে মজুরটির জীবন ব্যর্থ বলেছেন সে বলা অত্যন্ত আপেক্ষিক। কেননা ব্যর্থতার সংজ্ঞা প্রতিটি মানুষের কাছে ভিন্নভাবে প্রতিভাত। আমি 'কলম-পেষা মজুর' রাস্তার ধারের লোকটির জীবন-দর্শন না জেনেই তাকে ব্যর্থ বলি কিভাবে? ঐ ইট-ভাঙার মধ্যেই তার কাছে জীবনের কোনো অর্থ সত্য হতে পারে, ঐ ইট-ভাঙা তার কাছে শিল্পিত কারুকাজ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ঐ শব্দ তার কোনো গ্লানি ধুয়ে দিতে পারে, ভরিয়ে তুলতে পারে কোনো অপূর্ণ স্বপ্ন। তার ভাবনা একজন কলম-পেষা মজুরের জীবনদর্শনের সঙ্গে না মিললেই কি তাকে ব্যর্থ বলতে হবে? না, এতো সীমিত নয় জীবনের পরিসীমা, এতো ক্ষুদ্র নয় বৃহত্তর জীবনযাত্রা। দিগন্ত-ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের বড়ো অহংকার। কে জানে ঐ লোকটি মিছিলের প্রথম ব্যক্তি হবে কি না? কে জানে তিনি এমন একজন শহীদ হয়ে একটি দেশের স্বাধীনতাকে সক্রিয় করে তুলবেন না? কে জানে তাঁর জন্য একটি বিশেষ দিনের স্মৃতি-তর্পণ একটি জাতিকে গৌরবের শীর্ষে পৌঁছিয়ে দেবে না? ঠিক একইভাবে লেখকের জীবনও কোনো অর্থেই নিরর্থক নয়। যিনি বটতলার উপন্যাস রচনা করে লক্ষ পাঠকের মনোরঞ্জন করেন তারও মূল্য আছে। পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং সুস্থ বিনোদনের ভিত যদি একজন লেখক গড়ে তুলতে পারেন সেটাই বা কম কি? সুতরাং নিরর্থক শব্দটি দ্ব্যার্থক। এ ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি অচল। লেখক শুধু কলম-পেষা মজুর নন। শুধু পরিশ্রমে তাঁর ঘাটতি পোরে না, চাই মেধা এবং প্রজ্ঞার বাড়তি সুবাস।

চড়া গলায় মানবতার জয়গান গাইলেই কি লেখকের কলম-পেষা সার্থক হয়ে উঠবে? না কি অনাগতকালের পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করার জন্যে তাকে আরো কিছু কারুকাজ যুক্ত করতে হবে, যার ওপর নির্ভর করে রচনাটিকে বলা যায় কালোত্তীর্ণ? যেসব রচনা আবহমানকালের মানবজাতির সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়? যে কারণে তিনি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে হয়ে ওঠেন বিশ্বের? আনাতোল ফ্রাঁস লেখক গোর্কির সম্পর্কে বলেছিলেন, গোর্কি শুধু রাশিয়ার নন, গোর্কি সমগ্র পৃথিবীর। সুতরাং লেখকের কর্তব্য নিয়ে বাকবিতণ্ডা অনাবশ্যক। এ এমন এক দায়িত্ব যাকে নিয়মের নিগড়ে বাধা যায় না। এ হলো প্রমিথিউসের আগুন চুরি, যা অন্তর-প্রেরণা থেকে উৎসারিত। যে প্রজ্ঞা তাঁর সম্বল, তা দেশকাল মানে না, ইতরবিশেষ জ্ঞান করে না, তা ন্যায় এবং সত্যের পক্ষে লৌহকঠিন। যিনি এ দায়িত্ব পালনে অক্ষম, তার ভূমিকা গৌণ। যিনি পারেন মহাকাল তাঁকে স্মরণ করে।

যে কোনো মহৎ লেখকের লেখা আমরা বার বার আবিষ্কার করি। যতো দিন যায় ততো তার অর্থ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা মহাদেশের আস্বাদ পাই। মনে হয় এ নতুন ভূখণ্ড সোঁদালো গন্ধে আশ্চর্য তাজা এবং সতেজ। যখন আবিষ্কারের প্রয়োজন ফুরোয় তখনই একজন লেখক নিঃশেষ হন। প্রত্যেক মানুষ নিজের মধ্যে অগণিত সত্তাকে বহন করেন। সাধারণ মানুষ পারেন না বলেই লেখক সে বহুমুখী সত্তার প্রকাশ ঘটান। আর এখানেই অন্য সকলের সঙ্গে তার পার্থক্য। পাঠক লেখকের এই বহুমুখী সত্তার আবিষ্কারক। শব ব্যবচ্ছেদের মতো স্রষ্টাকে কেটে দেখেন। সময় এন্টিবায়োটিক। সকলের শরীরের জন্যেই প্রয়োজন। অথচ যে ক্ষমতাবান গ্রহণে পারঙ্গম তিনি টিকে যান, যিনি পারেন না তাঁর অবস্থান বিস্মৃতির অতলে। গল্পকার আবুল ফজল নতুন আবিষ্কারে উজ্জ্বল নন। তাঁর গল্প ক্ষণিকের সেতু হয়ে প্রবল স্রোতে ভেসে যায়। যুগের দোহাই দিয়েও তাকে ধরে রাখা যায় না।

আমি যুগ বুঝি না। বুঝি একজন স্রষ্টার শিল্পকর্ম। স্রষ্টার সঙ্গে শিল্পের সাযুজ্য। যুগ তার Hinter land. গ্রহণ এবং আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে চলে শিল্পের অগ্রগমন। আবুল ফজল তাঁর 'নির্বাচিত গল্প'র ভূমিকায় বলেছেন, ''কোনো মানুষই নিজের তৈয়ারি নয়। সব লেখকেরই মন-মানস অলক্ষ্যে, অনেক সময় লেখকের অজ্ঞাতে যুগের হাতেই গড়ে ওঠে। আমি আর আমার রচনাও তার ব্যতিক্রম নয়। আমার যুগ আমার গল্পের ভিতর দিয়েও কিছু কথা যে বলেনি তা নয়। তবে তার প্রকাশ সাহিত্য হয়েছে কিনা সে বিচারের ভার সাহিত্য-রসিকদের ওপর।'' আমার মনে হয় শিল্পী মাত্রই একটি একক ব্যক্তিসত্তা। তারপর তিনি যুগ, পরিবেশ, সমাজ এবং অতিরিক্ত আরো যা আছে তা আত্মস্থ করেন। সে আত্মস্থ পরিক্রমায় ভেসে ওঠে সত্যাসত্য। প্রশ্ন হলো, লেখক যুগকে প্রতিফলিত করবেন, না যুগ একজন লেখককে গ্রাস করবে? সমকালীন যুগচেতনা যদি একজন লেখক অতিক্রম করতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে যুগ সে লেখককে গ্রাস করেছে। একজন লেখককে যদি শুধু তাঁর সমকালীন যুগের পটভূমিতে আবিষ্কার করতে হয় তবে তা একজন শিল্পীর মহৎ উত্তরণে বাধাস্বরূপ। আমাদের দাবি যুগ হবে একজন লেখকের হাতের দাঁড়। ভীষণ ঝড়ের উথাল-পাতাল ঢেউয়ে অবলীলায় দাঁড় বাওয়া। এই না পারাটা লেখকের নিজস্ব সৌকর্যের ব্যর্থতা। যুগের দোহাই দিয়েও তাকে ক্ষমা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে যেমন ছিলেন একশো বছর পরেও তেমন। তাঁকে আবিষ্কার পাঠকের চেতনার সমৃদ্ধি মাত্র। এমনকি তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণকেও সময়ের যথেষ্ট ব্যবধান সত্ত্বেও কোনো যুগের পটভূমিতে বিচার করতে হয় না। একজন লেখকের রচনায় তাঁর যুগকে আমরা খুঁজে নেবো। যুগের পটভূমিতে বিচার করতে হয় না। একজন লেখকের রচনায় তাঁর যুগকে আমরা খুঁজে নেবো। যুগের পটভূমিতে স্থাপন করে সে লেখকের শক্তিকে আমরা খণ্ডিত করবো না।

আবুল ফজল তাঁর 'নির্বাচিত গল্প'র একই ভূমিকায় আর এক জায়গায় লিখেছেন, ''ব্যক্তি ও সমাজকে ব্যবহারিক জীবনে, দৈনন্দিন অভ্যস্থ মন চোখ দিয়ে যেটুকু দেখা বা জানা তা নেহাৎ খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। সাহিত্য আর শিল্পের আলোয় জানাই হচ্ছে যথার্থ জানা। আমরা অনেকে জীবনে বিলাত দেখিনি, অনেকের কাছে ইংরেজ দু'চোখের বিষ তা সত্ত্বেও ইংরেজি সাহিত্যের অনেক চরিত্র আজ আমাদের মনের মানুষে পরিণত। সাহিত্যের আলোতেই আমাদের মনে তারা দীপ্যমান ও উজ্জ্বল।''

চরিত্রকে মনের মানুষে পরিণত করতে পারাটাই তার স্রষ্টার বড় কৃতিত্ব। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে শিল্পের আলোয় দেখাটা সত্যিকার দেখা। যুগ, সমাজ প্রভৃতি গল্পের বক্তব্যে, লাইনে, চিত্রে, উপমায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে। পাঠক খুঁজে নিয়ে চিৎকার করে বলবে, এইতো পেয়েছি তোমাকে। নইলে যুগটা, সমাজটা শিল্পকে অতিক্রম করে সামনে এসে দাঁড়ালে বেয়াদব ছেলের মতো অসহ্য মনে হয়। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, '' ছোটগল্পের মধ্যে যুগ-মননের সন্ধান করতে হলে তাই অতি-স্পষ্টতার উপর নির্ভর করলে চলবে না। মনঃসমীক্ষণের কাজে যেমন অবাধ ভাবানুষঙ্গের ভিত্তিতে চিন্তার অসংলগ্ন সূত্রগুলিকে একত্র করে একটি অখণ্ডতার সন্ধান করতে হয়, তেমনি যুগ চেতনাকেও সেইভাবে নানা বৈচিত্র্যের এবং বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে সন্ধান করে নেওয়া দরকার। মোপাসাঁর দেশাত্মবোধক গল্পে, শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও লালসার কাহিনীতে এবং কৃষক-জীবনের চিত্রণে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব খণ্ড খণ্ড ভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে; তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে গেলে এদের মধ্যগত ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করা আবশ্যক।''

১৯৬৬ সালের পি.ই.এন. কংগ্রেসে পাবলো নেরুদা বলেছিলেন, 'Speak in the name of those who cannot write, if the poet did not make himself the spokesman of the human condition, what else was there for him to do.' উপর্যুক্ত বক্তব্যকে সত্য বলে মেনে নেয়ার পর প্রশ্ন জাগে human condition- এর সংজ্ঞার উপর। এই সংজ্ঞার ব্যাখ্যা এক-একজন লেখকের কাছে তার সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় human condition যে রকম, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তেমন নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এর সংজ্ঞা একদম ভিন্ন। প্রশ্ন হলো মানুষের স্বপক্ষে সোচ্চার হবার মতো অধিকার কি লেখকের থাকে? ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার লেখকের বিবেক কি তাঁর সরকারের দাবার ঘুঁটিতে পরিণত একটি দরিদ্র দেশের জনগণের পক্ষে সক্রিয় হয়? সমাজতান্ত্রিক দেশের লেখক কি অন্য দেশের ওপর তার সরকারের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেন? দারিদ্র্য পীড়িত ক্ষুধায় কাতর যেসব দেশের শাসকগোষ্ঠী human condition- এর ন্যূনতম চাহিদার নীচু স্তরে জীবনযাপন করে সে দেশের লেখক কি করে বুঝবে কিভাবে human condition- এর spokesman হতে হয়?

আসলে লেখকের চারপাশে এক অদৃশ্য নিগড় আছে। এই নিগড় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর। ইচ্ছে করলেই যা কিছু করার অধিকার যেমন নেই, তেমন যা কিছু লেখার স্বাধীনতাও নেই। নেই বলে সোয়েকার্নোর আমলে ইন্দোনেশিয়ার ঔপন্যাসিক মুখতার লুবিস এগারো বছর জেল খেটেছিলেন। আফ্রিকার কালো আদম বেঞ্জামিনের ফাঁসিতো সেদিনের ঘটনা। এতো নিপীড়নের পরও লেখক সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার হন বলেই তিনি জাতির বিবেক। এই দায়িত্ব লেখককে পালন করতে হয় বিভিন্নভাবে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় রাশিয়ান আগ্রাসনের পর ঔপন্যাসিক মিলান কুন্ডেরাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হলে তিনি ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত কুন্ডেরার উপন্যাস 'দ্য জোক'-এ লুই আরাগঁ যে ভূমিকা লিখেছিলেন, তা পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন তুলেছিলো। ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আরাগঁ ঘোষণা করেছিলেন তিনি আর সোভিয়েতের মাটিতে পা রাখবেন না। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি এ কথা রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হলো সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তিনি কুন্ডেরার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। আলজেরিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন জাঁ পল সার্ত্র। তাঁর এই ভূমিকা বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনে সহায়ক হয়েছিলো এবং দ্য গল সরকার বাধ্য হয়েছিলো আলজেরিয়ার স্বাধীনতা দিতে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সপক্ষে International Tribunal গঠন করেছিলেন ব্রার্টান্ড রাসেল। বিশ্ব জনমত গঠনে যা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিলো। এই একই কারণে কডওয়েল পেরেছিলেন স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হতে। কারণ লেখক জানেন দেশকে দোর্দণ্ডপ্রতাপে শাসন করা যেমন দেশপ্রেমের লক্ষণ নয়, সমাজব্যবস্থার ত্রুটির স্বরূপ উদঘাটনও তেমনি দেশদ্রোহিতা নয়। বক্তব্যের স্বাধীনতাই এ দুয়ের সমীকরণ ঘটায়। সরকারি আদেশ নির্দেশ উপদেশ কোনো সৃষ্টিশীল ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সেজন্যই নেমে আসে নিপীড়ন। সমসাময়িক যুগে নিপীড়িত এবং অত্যাচারিত হয়েও বহু প্রতিভা ইতিহাসে অমরতা লাভ করেছে।

সোলজেনিৎসিন লেখককে স্বদেশের 'দ্বিতীয় সরকার' বলে অভিহিত করেছেন : For a country to have a great writer is like having another Govemment. That is why no regime has ever loved great writers, only minor ones. (The first circle)। কোনো সরকারেরই গৌণ লেখককে ভালোবাসার কারণ নেই যদি সেই লেখকের মেরুদন্ড শক্ত থাকে। তিনি প্রধান লেখক না অপ্রধান সেটা বড়ো কথা নয়। প্রশ্ন হলো তিনি যা বলেছেন কতোটা সততার সঙ্গে বলছেন। সততার সঙ্গে বলতে না পারাটাই লেখকের জন্য অগৌরবের। প্রধান লেখকরা স্তম্ভ হন, অপ্রধান লেখকরা হন ইতিহাসের বহমান স্রোত। সেই স্রোত থেকেও খারিজ হয়ে যান বিবেকবর্জিত লেখকের দল।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের রাজনীতির লেখকরা কি কোনো সচেতন ভূমিকা পালন করতে পারছেন? ১৯৬২ সালে জন কেনেডির আমলে সুইডিশদের মনোভাব ছিলো আমেরিকার অনুকূলে। তখন জন স্টেইনবেককে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলে সমালোচকরা মন্তব্য করেছিলেন যে Steinbeck deserved great honor as a man, not as a writer. এই অপমান কি শুধু স্টেইনবেকের না কি সব লেখকের? স্টেইনবেক অবশ্য বলেছিলেন তাকে কেন পুরস্কার দেওয়া হলো তা তিনি বুঝতে পারলেন না তবে অর্থ পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একথা বলা। অর্থ কোনো লেখকের জন্যই শেষ কথা নয়।

প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েৎনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণে সুইডেন মার্কিনের বিপক্ষে চলে যায়। সুতরাং সোভিয়েতের পক্ষ অবলম্বনের জন্য ১৯৬৫-তে শোলোকভকে নোবেল পুরস্কার দেয়। শোলোকভ সোভিয়েতের অনুমোদিত লেখক। তাঁর প্রখ্যাত সাহিত্যকর্ম কোয়াইট ফ্লজ দ্য ডন এবং ভার্জিন সয়েল আপ্টার্সড তিরিশ বছর আগে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ সালে লাতিন আমেরিকার সাহিত্য সমালোচক গুয়েতেমালার মিগুয়েল অস্টুরামকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সময় সুইডিশ একাডেমির সেক্রেটারি ড. এন্ডারসন ওস্টারলিং লাতিন আমেরিকার প্রশংসা করেন এবং আমেরিকার সমালোচনা করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে প্রখ্যাত Jorge Luis Borges- এর নাম পুরস্কার তালিকায় থাকা সত্ত্বেও অস্টুরামকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে তিনি আহত হয়েছিলেন।

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাস থেকে আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে। কিন্তু প্রয়োজন নেই। লেখকরা রাজনীতির শিকার হচ্ছেন, অপমানিত হচ্ছেন এবং যথাযোগ্য মূল্যায়নের অভাবে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এতোকিছুর পরও বিশ্বের লেখককুল নোবেল পুরস্কারের বিরুদ্ধে তেমনভাবে সোচ্চার নন। কেন? এর বিরুদ্ধে কি লেখকদের কোনো দায়িত্ব নেই? সবাইতো জানেন পুরস্কার লেখকের মূল্যায়নের শেষ মানদণ্ড নয়। তবু এতোকিছুর পরও কেউ কেউ থাকেন যিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ করেন। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেননি জর্জ বার্নার্ড শ। আর জাঁ পল সার্ত্র? তিনি যে ভাষায় এবং যে যুক্তিতে এই পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা একটি দৃষ্টান্ত। তারপরও কথা থাকে। প্রতিবাদ একযোগে প্রবল না হলে তা খুব কার্যকরী হয় না। একটি দুটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে না। তাই এই পুরস্কারটি নিয়ে চলছে রাজনীতির এমন ছিনিমিনি খেলা।

লেখকের দায়িত্ব অনির্দেশিত বলেই কোনো সীমানা টানা নেই। এ কারণেই যে দায়িত্ব বৃহৎ দেশের লেখকদের পক্ষে পালন করা সম্ভব, সে দায়িত্ব কোনো অনুন্নত দেশের লেখকের পক্ষে পালন করা অসম্ভব। একজন সার্ত্রই পারেন আলজেরিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হয়ে ফরাসি সরকারের টনক নড়াতে। বাংলাদেশের কারো পক্ষে এমনটি সম্ভব নয়। উন্নত দেশের লেখকরা যে সুযোগ সুবিধা পান, অনুন্নত দেশের লেখকদের তেমন সুযোগ নেই। বাংলাদেশের একজন লেখকের সমস্যা ফুটপাথে মৃত মানুষ কিংবা ভূমিহীন কৃষক, জাপানের লেখকের সমস্যা আণবিক বোমা কিংবা কালো বৃষ্টি, দক্ষিণ আফ্রিকার লেখকের সমস্যা বর্ণবাদ, আমেরিকার লেখকের সমস্যা তারকাযুদ্ধ কিংবা চাঁদে বসতি, সোভিয়েতের লেখকের সমস্যা সাইবেরিয়ার ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ। তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় লেখকের দায়িত্ব?

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সমস্যা আরো প্রবল। এদের ঘাড়ের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো অনড় সামরিক শাসন, তাকে বিব্রত থাকতে হয় নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে। আজকের দিনে তৃতীয় বিশ্বের লেখকদের শেকড়-সন্ধানী অনুপ্রেরণা বৈরী সময়কে অতিক্রম করতে চায়, অতিক্রম করতে চায় মিলিটারি এ্যারিস্টোক্রেসির বদৌলতে বন্দুকের শাসন। কেননা এই শাসন-উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মূল্যবোধের অবক্ষয়। যে অবক্ষয় সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে ঢুকিয়ে রাখে কালো থাবা। যার নিষ্পেষণে পদদলিত হয় সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রমূর্ত রাখার দায়দায়িত্ব লেখকের। যে জন্য লেখক হন নীলকণ্ঠ। একই সঙ্গে অমৃত এবং হলাহল কণ্ঠে ধারণ করার দক্ষতা তাঁকে ইতিহাসে অমর করে।

শিল্পের দাবি কঠিন, লেখকের দায়ও বড় শক্ত। এই শক্ত দায় কতোভাবে, কতো পদ্ধতিতে পালিত হবে, একজন সৃজনশীল মানুষই তার উপায় নির্ধারণ করতে পারেন। অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন সার্ত্র। তিনি ব্যক্তির স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাস করতেন। বলেছেন, ব্যক্তি কেবল তার নিজের কাছেই দায়বদ্ধ, অন্য কারো কাছে নয়। কারণ ঈশ্বর বিহীন পৃথিবীতে ব্যক্তির সত্তা স্বাধীন। ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটা তার স্বাধীন সত্তার প্রকাশ। মনে হয় আপাত সরল এই বক্তব্যে অবাধ, মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক অঙ্গীকারের বাইরে রেখে তাকে যা কিছু করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আসলে কি তাই? যে ব্যক্তি নিজের কাছে দায়বদ্ধ সে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ না হয়ে পারে না। সার্ত্র ব্যক্তিকে নিজের কাছে দায়বদ্ধ করে তাকে তার প্রজ্ঞা ও বিবেকের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। তিনি

নিজেই বিবেকের কাছে যা সত্য বলে জেনেছেন তাকেই বড়ো করে দেখেছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোসহীন, অনমনীয়। বিশ্বমানবতার সংকটে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা নজিরবিহীন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কট্টর প্রবক্তা সার্ত্র, সবসময়ই ছিলেন শোষিত মানুষের পক্ষে। সাম্যবাদের বিরোধিতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু মার্কসবাদী পার্টির আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধেও ছিলেন সোচ্চার। তাঁর মতো, 'এই বাম, যা সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে, যা আজ বিধ্বস্ত, যা এক হতচ্ছাড়া দক্ষিণপন্থীকে জয়ী হতে দিচ্ছে।' কতো আগের কথা। বিশ্বজোড়া মার্কসবাদী পার্টির কার্যকারণে এই সত্য প্রতিফলিত হয়েছিলো। '৮৯-তে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশে মার্কসবাদের পতন কতো দ্রুত একজন চিন্তাশীল লেখকের ধারণাকে বাস্তবায়িত করেছে।

সার্ত্র তাঁর দীর্ঘ জীবনসাধনায় প্রতিনিয়ত অনুশীলন এবং অনুসন্ধান করেছেন। মার্কসবাদীরা কখনো তাঁকে কাছে টেনেছে, কখনো দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সত্য কথা বলার জন্য তিন সবার কাছে প্রিয় হননি। তাতে সার্ত্রের কোনো ক্ষতি হয়নি। জয়ী হয়েছে লেখকের সত্য, জয়ী হয়েছে শিল্পের দায়।

একই কথা ওঠে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। চল্লিশের দশকে মার্কসবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে সামন্তবাদী চেতনার ধ্বজাধারী বুর্জোয়া ভাববাদী ইত্যাদি নানা অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর রচনা বাতিল করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অথচ স্বদেশের নানা সংকটে, দুর্যোগে, দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিলো সবসময় সাহসী, আপোসহীন। তিনি যে অনমনীয় ভূমিকা পালন করেছেন দেশের অনেক বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতারা তা করেননি। শুধু কি তাই, তিরিশের দশকে ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তিনি তীব্র ধিক্কার জানিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। হিটলারের নাৎসী বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়ার চিঠির তিন সংখ্যক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আপাতত রাশিয়া এসেছি। না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত।' চিঠিটা ১৯৩০ সালের ২৫ ডিসেম্বর লেখা। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া মানবতাবাদী। তিনি সমাজতন্ত্রের বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু 'তীর্থদর্শন' শব্দটির মধ্য দিয়ে মানবতার জন্য যে গভীরতম ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। তিনি একটি ভিন্ন মেরুর মানুষ হয়েও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে তীর্থদর্শন বলেছেন। স্পষ্ট বোঝা যায় তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের জন্যও ছিলো তার গভীর মমতা। ১৯৪১-এ ফ্যাসিসট হিটলার আক্রমণ করেছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। তখন তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়। তিনি অসুস্থ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীস তাঁর জীবনীতে লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন খবরের কাগজের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। যেদিন দেখতেন সোভিয়েত সৈন্যরা পিছু হটেছে, নাৎসীরা এগিয়েছে, সেদিন তিনি কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। সারাদিন তাঁর খারাপ যেতো। যেদিন দেখতেন সোভিয়েত বাহিনী এগিয়েছে, নাৎসীরা পিছু হটেছে সেদিন তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। বলতেন, 'সোভিয়েত কখনো পরাভব মানবে না।' অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি সানন্দে কলকাতায় সদ্যগঠিত 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র পৃষ্ঠপোষক হতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। এখানেই শিল্পীর দায়, মত-পথের আদর্শের প্রশ্ন নয়, শিল্পী চান ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে মানবতার জয়।

লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার লেখকরা সৃষ্টিশীল রচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের শেকড়ের সন্ধান করেছেন। তাঁরা এই দায়বদ্ধ চেতনা থেকেই রাজনীতি ও সংস্কৃতির রাখিবন্ধন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক প্রেরণা সঞ্চারিত করেছেন। এ এমন এক অভিনব ধারা যে বিশ্বের পাঠকের দৃষ্টি এখন তাদের দিকে ঘুরে গেছে। ঔপনিবেশিক শাসন সামরিক শাসন, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি, সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার কষ্ট নিয়ে তাঁরা ভিন্ন আঙ্গিকে গল্প-উপন্যাস-কবিতা লিখেছেন। শুধু সত্যের উদঘাটন করেননি। তাঁকে শিল্প-সফলও করেছেন। এভাবেই বদলে যাচ্ছে শিল্পের বিষয়, আঙ্গিক- বদলে যাচ্ছে চেতনা, অনুভব। লেখকের শিল্পের খনন নিরন্তর চলে। তাঁর দায় তাঁকে কোন অনির্দিষ্ট সত্যে বেঁধে রাখে তো নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বাংলাদেশের লেখকরাও বিশ্ব-পটভূমির এই ধারাবাহিকতার বাইরে নয়। আমরা যদি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় মূল্যায়ন করি দেখবো লেখকরা এই ইতিহাসের মৌল উপাদান সৃষ্টিতে কতো ব্যাপক এবং গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছেন। পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পূর্ববঙ্গের

ছাত্রদের উপর বাংলা ভাষা ব্যতীত যদি অন্য কোনো ভাষা আরোপ করা হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবা জানানো আমাদের উচিত। এমন কি প্রয়োজন হইলে ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ করা উচিত। বাংলা ভাষ অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব। নতুন ভাষা আরোপ করা পূর্ববঙ্গে গণহত্যারই শামিল হইবে।'

গণহত্যার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। গণহত্যা দিয়ে শুরু হয়েছিলো এ দেশের স্বাধীনত যুদ্ধের ইতিহাস। সে সময় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সমসাময়িক সচেতন লেখকরা অনেকের রচনা থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে। লেখকদের এই দায়বদ্ধ ভূমিকার কারণে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ২৫ মা পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হত্যা করেছে। একই কারণে মুক্তিযুদ্ধের শেষের দুদিন আগে রাজাকার-আলবদর বাহিনী বুদ্ধিজীবীদেরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে তারা চেয়েছিলো একটি স্বাধীন দেশের মেধার শূন্যতা, বিবেকের শূন্যতা-সৃজনশীলতার শূন্যতা। কারণ সৃজনশীল মানুষেরাই পারেন গণমানুষের চেতনায় স্বপ্নের ফুল ফোটাতে।

আমি 'কালকেতু ও ফুল্লরা' নামে একটি উপন্যাস লিখেছি। যে উপন্যাসে মিথ প্রসারিত হয়েছে বর্তমান জীবনে মিথের ভেতর থেকে উঠে আসা নায়ক বর্তমান সময়ের পটভূমিতে ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। ফলে উপন্যাসের মূল বিষয় হয়ে যায় একজন স্বৈরাচারী শাসক ও জনগণ। জনগণ যখন একটি শক্তিতে পরিণত হয় তখন তার হাতে স্বৈরাচারের দম্ভের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়। তার আগে জনগণের হাতে নিরস্ত্র হয় উপন্যাসের নায়কের সামরিক বাহিনী। কাহিনীটি এমন : কালকেতু ও ফুল্লরা ষোড়শ শতাব্দীর কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক-নায়িকা। আমি আমার উপন্যাসে সাহিত্যের এই চরিত্র দুটোর পুনর্নির্মাণ করেছি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে আছে, দেবী দুর্গার প্ররোচনায় শিবের অভিশাপে স্বর্গ থেকে চ্যুত হন ইন্দ্রের ছেলে নীলাম্বর। তিনি মর্ত্যলোকে ব্যাধ ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। দেবী কালকেতুর মাধ্যমে মানুষ্যলোকে তাঁর পূজো চান। তিনি কালকেতুকে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়ে নগর পত্তন করতে বলেন। কালকেতু ছিলো ব্যাধ, পশু শিকার করে জীবনধারণ করতো। তার স্ত্রী ফুল্লরা চুবড়ি ভরা মাংস মাথায় নিয়ে ফেরি করে বেড়াতো। দেবীর কাছ থেকে ধন পেয়ে কালকেতু নগর পত্তন করে তাঁর নগর একটি ছোটখাট স্বর্গরাজ্য। এই নগরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার। সুখে-শান্তিতে নগর পরিচালনা করে অভিশাপমুক্ত হয়ে কালকেতু নীলাম্বর হয়ে আবার স্বর্গে ফিরে যায়। কিন্তু আমার কালকেতু নগর পত্তনের পর একজন ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়। সে এই নগরকেও তিলোত্তমা নগর হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। পরিশেষে এই নগরকে ও নিজের খেয়াল খুশিমতো পরিচালনা করে। গড়ে তোলে তীরন্দাজ বাহিনী। এই কালকেতু নিজের নগরকে মনে করে স্বর্গ। স্বর্গে ফিরে যাওয়ার কথা ও ভাবতেই পারে না। সে একজন স্বৈরচারী একনায়কে পরিণত হয়। ফলে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় নগরবাসীর। কালকেতুর স্বৈরশাসন থেকে ওরা মুক্তি চায়। কালকেতুর পতনের দাবিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হয় নগরের প্রধান চত্বরে। ওরা রচনা করে মানব-দেয়াল। কালকেতুর তীরন্দাজ বাহিনী ওদের দিকে তীর ছোঁড়ে। সহস্র জন মারা যায়। একসময় দেখা যায় ওদের তূণ থেকে সব তীর নিঃশেষ। ওরা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন জনগণের প্রতিনিধি ঘোষণা করে যে, ওরা নিরস্ত্র হয়ে গেছে একটিমাত্র তীরইতো ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান রচনা করে রেখেছে। ঐটি না থাকলে তো আমরা সবাই সমান কালকেতু এভাবেই আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। এখন থেকে ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো তফা নেই। এখন থেকে আমাদের এই ছোট্ট নগরের জন্য আমরা কোনো তীরন্দাজ বাহিনী রাখবো না। এরপর জনগণ কালকেতুর প্রসাদ আক্রমণ করে। জনগণের আদালতে কালকেতু ও ফুল্লরার ফাঁসি হয়। ওদের বেঁধে রাখা হয় কালকেতুর নির্দেশে তৈরি ওরই স্বর্ণমূর্তির সঙ্গে। তারপর নগরের চত্বরে ফাঁসি-মঞ্চ তৈরি করে স্বৈরাচারী দম্পতির ফাঁসি কার্যকর করা হয়। সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি আমি লিখতে শুরু করি ১৯৮৯ সালে, লেখা শেষ হয় ২৮.১১.১৯৯০ তারিখে। কিন্তু উপন্যাসটি শেষ করার পর থেকে অস্বস্তিতে থাকি এই ভেবে যে, এই স্বপ্ন তো আমি শিল্পের মধ্যে দেখেছি। বাস্তবে কি এর রূপায়ন হবে? হলে হবে? সঙ্গে সঙ্গে এও ভেবেছি। যে, না হলে তো ইতিহাসের গতি মিথ্যে। ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে জনগণের বিজয় বাস্তবে রূপলাভ করে। সে কারণে লেখক শু সাহিত্যে জীবন নির্মাণ করেন না, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেও তাঁর নিজের শিল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন

তাই গণমানুষের কথা সরবে উচ্চারিত না করেও বড়ো লেখকের রচনায় ফল্গুধারার মতো বয়ে যায় সে অন্তঃস্রোত। যে কারণে আমরা হোমার পড়ি, পড়ি শেক্সপিয়র, রামায়ণ, মহাভারত, শাহনামা, গালিব, খৈয়াম। আমাদের যাপিত জীবনের দিগন্ত পরিব্যপ্ত করে রাখে এইসব রচনা। দ্রুপদী রচনায় তাই দেশ থাকে না, থাকে না খণ্ডিত রূপোলি আকাশ। তা সব কালের সব মানুষের।

তাই লেখকের মৌল দায়িত্ব ভালো লেখা। নিজের প্রতি সৎ থেকে নিজের অনুভবকে শক্ত মেরুদণ্ড দেওয়া লেখকের কর্তব্য। তিনি যেন কখনো পরগাছা না হন, অন্যের ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাসত্ব স্বীকার না করেন। জনপ্রিয়তা ভালো লেখকের বিবেচনার বিষয় নয়। রাজনৈতিক কমিটমেন্ট লেখকের মানসিক আশ্রয়, মানবিক উচ্চারণ লেখকের প্রাথমিক শর্ত, দেশকাল তাঁর জীবনযাপনের অষ্টপ্রহর যন্ত্রণা। এতোকিছুর পরও শর্ত ভালো লেখা- বিপ্লবী দায়িত্ব ভালো লেখা। যে লেখা বক্তব্যের সঙ্গে শিল্পের নির্মাণের এক মহাকালিক অগ্রযাত্রা।

নেহরীন খান সম্পর্কে বাবা আকবর আলি খানের গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 'তার অসমাপ্ত নোটগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সে মোনালিসা, লিপি এবং হেলেন কেলারকে নিয়ে একটি গল্প লেখার চেষ্টা করছিল। তিন নায়িকা সম্বন্ধেই আলাদা আলাদাভাবে অনেক কিছুই লিখেছে। এগুলো একত্র করলে হয়তো একটি সুন্দর গল্প রচিত হতে পারত।

নেহরীনের তৃতীয় গবেষণার বিষয় ছিল ভারতে মহিলাদের অবস্থান। নেহরীন শুধু ভারতীয় মহিলাদের আর্থিক দুরবস্থা নিয়েই চিন্তিত ছিল না, সে ভারতীয় মহিলাদের সামাজিক দুরবস্থা নিয়েও অনেক বেশি চিন্তিত ছিল। এ জন্য প্রয়োজন মহিলাদের চেতনার সম্প্রসারণ। এ সম্পর্কে লেখার জন্য সে আরও পড়াশোনা করছিল। নেহরীন খান কোনো লেখাই শেষ করে যেতে পারেনি। তবে তার লেখার জন্য যেসব নোট সে করেছিল, তা পড়লে বোঝা যায় যে তার অনেক সুন্দর লেখার সম্ভাবনা ছিল। এ লেখাগুলো পড়লে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে পড়ে :

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

সাহিত্যের শিল্পবোধ নেহরীন খানের চেতনায় গভীর তাৎপর্যে বহমান ছিল। এই থাকা এই প্রজন্মের নবীন লেখকের স্বপ্নের সাধনা হোক। তাঁরা নেহরীন খানকে স্মরণ করবে সাহিত্য চেতনার সচেতন বোধে। আমি গভীর ভালোবাসায় নেহরীন খানকে স্মরণে রাখব। তাঁর বাবা তাঁর স্মরণে সাহিত্যের বড় একটি আয়োজন করেছেন। এটি আমাদের নবীন প্রজন্মের এগিয়ে যাওয়ার পথ-নির্দেশনা। তাঁদেরকেও ডাকা হবে এই স্মারক বক্তৃতা প্রদান করার জন্য। এই প্রত্যাশা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ সবাইকে।

****

EAST WEST UNIVERSITY

PROGOTI FOUNDATION FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT

PERMANENT SANAD HOLDER

A/2, Jahurul Islam Avenue, Jahurul Islam City

Aftabnagar, Dhakak-1212, Bangladesh

Tel: 09666775577, 9858161

E-mail: admission@ewubd.edu

URL: http://www.ewubd.edu